সেই বেড়াল ছানাটি

বনি আমিন

অন্দর আঙ্গীনা থেকে হঠাৎ বেড়ালের মিঁউ মিঁউ কচি ডাক শুনে আমি জিজ্ঞাসু মনে সেদিকে এগিয়ে যাই। সবুজ গাছের ঘন শাখা পল্লব ভেদ করে বিকেলের সোনারোদ তখন আছড়ে পড়ছিল আমার বাড়ীর আঙ্গিনায়। দরোজা খুলে দেখি আমার মেয়ে ইসাবেলা তারই সমবয়সী মাসতুতো বোন রাইসাকে নিয়ে একটি বেড়াল ছানাকে আদর করে এক পেয়ালা দুধ দিয়ে আপ্যায়নে প্রাণান্ত চেষ্টা করছে। বেড়াল ছানাটির কাছে ঐ শুভ্র তরল পদার্থটি তখনো হয়তো অচেনা, তাই পেয়ালার দিকে ও তেমন ভ্রুক্ষেপ করছিলনা। ভয়হীন অথচ অসহায় এ বেড়ালটির দুচোখের দৃষ্টিতে করুণ অনিশ্চয়তা ও অজানা পরিবেশের বিস্ময়তা। জিজ্ঞেস করে জানলাম কিছুক্ষণ আগে ওরা এই পথহারা বেড়ালটিকে বাড়ীর পেছনের আঙ্গিনায় আবিষ্কার করেছে। আগন্তুক বেড়াল ছানাটিকে পোষার জন্যে ইসাবেলা আবদার করে বসলো, যা অনেকদিন ধরেই সে বায়না করে আসছিল। আজ তাই দৈবক্রমে কুড়িয়ে পাওয়া মানিক সে হাতছাড়া করতে চায় না। এদেশে বাড়ীতে পশু পোষা ও তার আইনগত দায়বদ্ধতার কথা ভেবে আমি সায় দেইনি। কিন্তু গিন্নীর চেঁচামেচি আর ছেলের সুপারিশের নাকিসুরে কখোন যে সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে লক্ষ্য করিনি।

গ্রামের গোয়ালঘর হতে খড়-জ্বালানো ধোঁয়া বায়ুহীন শীতের রাতে হিমভারাক্রান্ত হয়ে স্তরে স্তরে বাঁশঝাড়ের মধ্যে যেভাবে আবদ্ধ হয়ে থাকে ঠিক তেমনিভাবে আমার বাড়ী ঘেরা সবুজ গাছ গাছালীতে কুয়াশার চাদর সন্ধ্যাকে সেদিন আরো ঘনিভূত করে দিয়েছিল। অসহায় বেড়াল ছানাটিকে এ আঁধারে কার দুয়ারে ঠেলে দেব ভেবে মন আমার ব্যাকুল হয়ে ওঠে। শুধুমাত্র একরাত রাখার অনুমতি পেয়ে অন্তিম কৃষ্ণপক্ষের ঐ ঘনঅন্ধকারেও আমার মেয়ে যেন শুক্লপক্ষের ভরা-চাঁদ হাতে পেল। কিন্তু আমি পড়ে গেলাম মহা ভাবনায়, কারণ বেড়ালের প্রকৃত মালিক খুঁজতে খুঁজতে আমার খিড়কীর সামনে এসে যদি কোনদিন আবির্ভূত হয় তবে অপমানের শেষ থাকবেনা।

আমার স্ত্রী ও ইসাবেলার বায়নাতে আমি বাধ্য হয়ে পরদিন সকালে ক্যান্টারবারী কাউন্সিল অফিসে ফোন করে বিষয়টি জানাই। তাদের কথানুযায়ী মালিকানা নিরূপনের জন্যে বিকেলে কাজ শেষে একটি জুতোর খালি বাক্সে ভরে বেড়ালটিকে দলবেঁধে কাউন্সিল অফিসে নিয়ে যাই। নির্দিষ্ট বহনকারী খাঁচাছাড়া জুতোর বাক্সে বহন করেছি বলে কাউন্সিলের পেট্ ওয়েলফেয়ার অফিসার আমাকে অনুযোগের সুরে সতর্ক করে দেন। খোঁজাখোঁজি করে বেড়ালের গলায় অথবা চামড়ার ভেতরে তার পূর্ব মালিকের পরিচিতি বহনকারী কোন মাইক্রোচিপ তারা খুঁজে পায়নি। আমরা চাইলে পুষতে পারি, কিন্তু সর্বাগ্রে এর বয়স নিরূপন, জন্ম রেজিষ্ট্রেশন, মেডিকেল চেকআপ ও মাইক্রোচীপ স্থাপনের জন্যে আমরা নিকটস্থ কোন ভেটেনারারীতে যেতে হবে বলে কাউন্সিল আমাদের উপদেশ দেয়। তাদের কথানুযায়ী পরের দিন উপল ও ইসাবেলাকে নিয়ে আমি একজন ভ্যাটের কাছে যাই। মেডিকেল চেকআপ ও কনসালটেশনে ত্রিশ ডলার এবং চামড়ার ভেতরে বেড়ালের জন্মবৃত্তান্ত ও মালিকানা পরিচিতির মাইক্রোচিপ্স লাগাতে আরো বাড়তি নগদ সত্তর ডলার আমার পকেট থেকে খসে গেল। পরীক্ষা করে ডাক্তার বেড়াল ছানাটি নিরোগ এবং এর বয়স মাত্র

পাঁচ সপ্তাহ বলে নিরূপন করে। কি খাওয়াতে হবে, কিভাবে পুষতে হবে এবং কি আচরনে বেড়ালের ভাষা বুঝা যাবে এ নিয়ে আমার ছেলে ও মেয়েকে ভেট্ (পশু ডাক্তার) প্রায় আধাঘন্টার একটি দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করলেন। স্কুলে ক্লাস শিক্ষকের লেকচারে ওরা কতটুকু মনযোগ দেয় আমি তা কখনো স্বচোক্ষে দেখিনি কিন্তু সেদিন ভেটের লেকচারের প্রতি গভীর একাগ্রচিত্ততা আমি তাদের চোখে দেখেছি। জন্ম সনদ পুরণের সময় ডাক্তার বেড়ালছানাটির নাম জানতে চাইলে উপল ঝটপট 'বকুল' বলে প্রস্তাব করে। ঘরে ফেরার পথে পেট্শপ থেকে বকুলের শোয়ার জন্যে নরম মখমলের ঝাঁপি, বহন করার খাঁচা ও বয়সভিত্তিক এক মাসের খাদ্যরসদ ক্রয় করি। গলায় ঝুলানোর জন্যে ইসাবেলা একটি ঝুনঝুনি বেল্টও খরিদ করে ঝুড়িতে ঢুকিয়ে নেয়। সবমিলিয়ে পেটশপে আরো দুশ ডলারের মতো সেদিন আমার খরচা হয়ে গেল। আমি ওদের মনের কথা ভেবেছি কিন্তু ওরা আমার পকেটের কথা ভেবেছে কিনা জানিনা, ওদের তখন সে বয়েসও হয়নি। তবে ওদের অনাবিল আনন্দ ও নির্মল হাসি সেদিন শুন্য পকেটেও আমাকে সত্যি বড় পরিতৃপ্ত করেছিল। দু'সপ্তাহ পরে ডাকযোগে কাউন্সিল থেকে আমাদের বকুলের জন্ম সনদ আসে। দেখলাম পরিবারের অবিচ্ছেদ্য সদস্য হিসেবে সকলের নামের সাথে মিল রেখে বকুলের সারনেম ওরা 'আমিন' দিয়েছে। অর্থাৎ আমাদের পোষা বেড়ালটির পুর্ন নাম হলো 'বকুল আমিন'। বকুলের পরিচর্যা ও নিরাপত্তা বিষয় বিবেচনা করে প্রায় আমি চিন্তিত থাকতাম। কারণ প্রবাসের ব্যস্ত এ নগরভিত্তিক জীবন ব্যবস্থায় আমাদের অবহেলা ও আচরনে যদি কোনভাবে ওর প্রতি কোনধরণের নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পায় তবে আইনি ঝামেলার অন্ত থাকবেনা। পোষা ও গৃহপালিত পশু পাখীদরে তদারকি ও কল্যাণার্থে অষ্ট্রেলিয়াতে আগষ্ট ১৮৯২ সনে RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) নামে একটি পশু-নিরাপত্তা সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যা পরিবর্তিতে ১৯২০ সনে ব্রিটিশ রাজপ্রাসাদের প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক অনুদানে ও অষ্ট্রেলিয়ান গভর্ণর স্যার হ্যারী বার্টন এর সহযোগীতায় একটি পুর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এ সংস্থাটির ইন্সপেক্টর ও গোয়েন্দাদের কর্মতৎপরতা ও আইনি ক্ষমতা সাধারণ পুলিশের চেয়ে কোনাংশে কম নই। বন্য অথবা যেকোন পোষা পশু পাখীর প্রতি কোন অনাচার, নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতা হচ্ছে শুনলে এরা আইনি ক্ষমতাবলে যেকোন তালাবদ্ধ বাড়ীতে ভেংগে প্রবেশ করার অধিকারও রাখে।

কুইন্সল্যান্ডের উত্তরে প্রশান্ত মহাসাগরের পাড়ে টাউনস্ভীল শহরের বৃহত্তর সেনানীবাস থেকেই দখলকৃত ইরাক ও যুদ্ধেলিপ্ত বিশ্বের অন্যান্য দেশে অষ্ট্রেলিয়া সাধারণত সৈন্য পাঠিয়ে থাকে। ভীনদেশে এস্তেমাল করার জন্যে এ সেনানিবাসের সৈন্যরা অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা বিষয়ে কোন বিশেষ ট্রেনিং নেয় কিনা আমি জানিনা তবে গত বছর ব্যারাকের আশেপাশে কয়েকটি ভবঘুরে বেড়ালের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের জন্যে স্বদেশেই আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল ছয়জন সৈনিককে। ইরাকের পথে অপেক্ষারত এ

সৈনিকরা ২০০৪ সনের এপ্রিলে ঈষ্টারের বন্ধে এক সন্ধ্যায় মদমত্ত হয়ে চারটি ভবঘুরে বেড়ালকে আটক করে। পরে তামশার ছলে নিরীহ বেড়ালগুলোর গলায় রশি লাগিয়ে একটি ফোরহুইল গাড়ীর পেছনে বেঁধে পীচঢালা রাস্তায় হৈ হুল্লুড় করে সারা ব্যরাকে তারা হেঁচড়ে বেড়ায়। অবশেষে মুমুর্ষ তিনটি বেড়ালের গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন লাগিয়ে ওদের মৃত্যুযন্ত্রণার আর্তনাদের সাথে সুর তুলে "জীবে প্রেম করিছে যে জন, সে জন সেবিছে ঈশ্বর" বানীটি সমস্বরে মাতালাবস্থায় ওরা জপেছিল। সৈনিকদের ঐ নিষ্ঠুর ও বীভৎষ আচরণ দেখে তাৎক্ষনিক মিলিটারী পুলিশ ওদের গ্রেপ্তার করে এবং পরবর্তিতে পশু-নিরাপত্তা সংগঠন এদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা ঠুকে দেয়। দ্রুত আদালত দুমাসের মধ্যে বিচার করে প্রতিটি অপরাধী সৈনিককে ১০০ ঘন্টা করে কমিউনিটি ওয়ার্ক ও মাথাপিছু দু'হাজার ডলার করে জরিমানা করেছিল। চারটি বেড়ালের চাঞ্চল্যকর মৃত্যু সংবাদটি রেডিও, টেলিভিশন সহ অষ্ট্রেলিয়ার প্রায় প্রতিটি জাতীয় গণমাধ্যমে তখন ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল। বেড়ালের প্রতি আরেকটি নিষ্ঠুর সংবাদ ২০০৫ সনের গোড়াতে সারা অষ্ট্রেলিয়ার মানবতাবাদী জনসাধারণকে হতবাক করে দিয়েছিল। তিনজন দুষ্টু নাবালক ছেলে সিডনী'র একটি রেলষ্টেশনের পাশে একটি ভবঘুরে বেড়ালের গলায় দড়ি বেঁধে রেললাইনের দীর্ঘ পথ ধরে টেনে হেচঁড়ে নিয়ে যায় এবং অজ্ঞান হওয়া অবদি বেড়ালটিকে বালকত্রয় নানা কায়দায় নির্যাতন করেছিল। আশেপাশের দর্শকদের ডাকে তড়িঘড়ি এ্যানিমেল রেসকিউ স্কোয়াড ও পুলিশ এসে অসহায় বেড়ালটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। টানা তিনদিন ইনটেন্সিভ কেয়ারে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে অভাগা বেড়ালটি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। রেল ষ্টেশনের সিসিটিভি ক্যামেরা প্রতিটি দোষী বালকের ঐ নিষ্ঠুর কর্মকান্ড ভিডিওতে ধারন করেছিল। বাদী হয়ে পশু-নিরাপত্তা সংগঠন আদালতে ঐ ভিডিও দাখিল করে এবং বিচারক প্রতিটি বালককে কচিবয়স সত্তেও ঐ অভাবনীয় নিষ্ঠুরতার জন্যে জেল ও জরিমানা করে। জাতীয় প্রচার মাধ্যমে এ নিষ্ঠুর সংবাদটিও অষ্ট্রেলিয়াতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

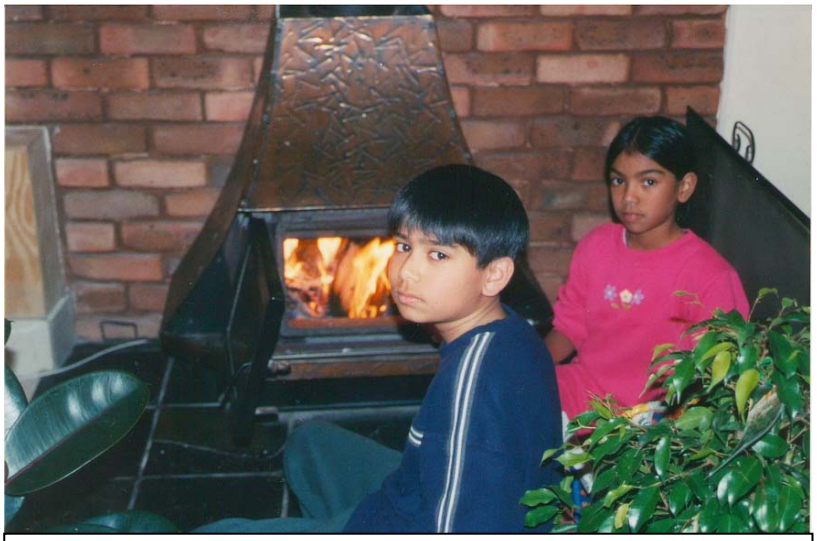

হাঁড়কাঁপা শীতে উপল ও ইসাবেলা বাড়ীতে কাঠপোড়া উনুনে তাপ পোহাচ্ছে।

বকুল আমাদের সংসারে এসেছে দু'মাস হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে সকলের হৃদয় জয়ের পাশাপাশি সে আমাদের বাড়ীর প্রতিটি অংশকে চিনে আপন করে নিতে শুরু করেছে। একদিন বিকেলে বাড়ীর আংগীনাতে আমার ছেলে উপল তার দু'জন বন্ধুকে নিয়ে ক্রিকেট প্র্যাকটিস করছিল। কৌতুহলি বকুল এক কোনে বসে ক্রিকেট বলের এদিক ওদিক ছোঁড়াছুড়ি দেখে চমকিত হয় আর মাঝে মাঝে দৌড়ে এসে তা ধরতে যায়। এরিমধ্যে আচানক একটি বোলিং ছুটে এসে বকুলের মাথা থেত্লে দেয়। কচিমাথায় কঠিন

আঘাত বকুল সইতে পারেনি। রক্তাক্তবস্থায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় আমাদের প্রানাধিক বকুল। বাচ্চাদের চিৎকারে আমি দৌড়ে নীচে নেমে আসি। সাহায্য চেয়ে তাৎক্ষনিক ভেটেনারারী হাসপাতালের জরুরী বিভাগে ফোন করি। তাদের এ্যম্বুলেন্স এসে ইনকিউবিটরে ভরে বকুলকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যায়। স্বপরিবারে আমরা সকলে তাদের পেছনে হাসপাতালে ছুটি। দ্রুত বকুলকে ডাক্তার ও-টিতে নিয়ে যায়। প্রাথমিক দর্শনে ডাক্তার তাৎক্ষনিক মন্তব্য করলো, উক্ত আঘাতে বকুল হয়ত একটি চোখ হারাতে পারে অথবা বাকি জীবন আংশিক বিকলাঙ্গ হয়ে থাকতে পারে। অপারেশনের পর বকুলের অবস্থা জানার জন্য আশংকিত মনে সারারাত আমরা সকলে ঘরে টেলিফোনের গোড়ায় ঠাঁই বসে থাকি। ক্ষনে ক্ষনে আমার স্ত্রীও ছেলেমেয়েদের সাথে সুর করে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। ওদের সম্মিলিত কান্নায় আমারো অশ্রু সম্বরণ করা তখন কঠিন হয়ে পড়েছিল। অপেক্ষার যেন শেষ হয়না। রাত বারোটায় ফোন করে হাসপাতাল থেকে জানালো বকুল আশঙ্কামুক্ত এবং তেমন জটিল কোন অপারেশন প্রয়োজন হয়নি। তবে 'পোষ্ট অপারেশন ট্রমা' কাটিয়ে ওঠার জন্যে হাসপাতালে ওকে আরো দু'দিন রাখতে হবে। ভোরে সকলে পুনরায় বকুলকে দেখতে হন্ত দন্ত হয়ে আমরা সকলে ছুটে গেলাম। নার্স ট্রলি ঠেলে একটি খাঁচার ভিতরে নরম বিছানায় শায়িত বকুলকে আমাদের কাছে নিয়ে আসে। ওর বিছানার পাশে এক ঘটি জল ও কিছু শুষ্ক খাদ্য। ওর দুচোখ ভরা জল আর মাথায় ব্যান্ডেজ দেখে সেদিন আমরা কেউ অশ্রুসম্বরন করতে পারিনি। প্রতিদিন দু'বেলা করে আমরা সকলে হাসপাতালে ওকে দেখতে ছুটে যেতাম। তিনদিন পর ওকে ফেরত আনতে গেলে হাসপাতালের ছাড়পত্রের সাথে সংযুক্ত বিল দেখে আমার বাঁ পাশের বুকপকেটের ঠিক পেছনে অবস্থিত অন্তরটি আতঁকে উঠে। অপারেশন, ঔষধ ও তিনদিনের হাসপাতালের শয্যা খরচ হিসেবে ৪৭০ ডলারের একটি দীর্ঘ আইটেমাইজড্ বিল ডাক্তার আমাকে ধরিয়ে দিল। আমার ইতস্ততভাব দেখে ডাক্তার জানালো এ বিল পরিশোধ করে আমরা বকুলকে যদি নিতে না চাই তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বকুলকে RSPCA এর কাছে হস্তান্তর করবে। তারপর অন্য কেউ ওকে দত্তক হিসেবে না নিতে চাইলে অথবা RSPCA এর পশু হোষ্টেলে স্থান সংকুলান নাহলে নিয়মানুযায়ী এক মাস পর বকুলকে উচ্চামাত্রার বেদননাশক ঔষধ দিয়ে ওরা শান্তপ্রিয়ভাবে চীরদিনের জন্যে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। কিংকর্তব্যবিমুঢ় আমি, আমার দুপাশে ইসাবেলা ও উপল আর সামনে আমাদের কনিষ্ঠ ও তৃতিয় সন্তান বকুল। ডাক্তারের সাথে কথোপকথনের সময় অসহায় বকুলের ছলছল দু'টি চোখ ছিল তখন আমাদের দিকে। অনাথ হওয়ার আশঙ্কায় দিশেহারা বকুল, দুচোখে তার নিদারুন বিষন্নতা। পকেটে রাখা আমার হাত দুটি কখন যেন অজান্তে ইসাবেলা ও উপলের চোখের জল মোছার জন্যে বেরিয়ে আসে। হাসিমুখে বিল পরিশোধ করে আমরা সকলে বকুলকে নিয়েই সেদিন ঘরে ফিরি।

বনি আমিন, সিডনী

পাদটিকাঃ

বনি আমিন 'অষ্ট্রেলিয়ার পথে পথে' শিরোনামে ২০০৫ এর পুরো বছর একটি নিয়মিত কলাম পাক্ষিকভাবে বাংলাদেশের জাতীয় পত্রিকা 'দৈনিক আমার দেশ' এ লিখতেন। তার এ লেখাটি একই পত্রিকায় উক্ত কলামে গত ৭ই সেপ্টেম্বর ২০০৫ প্রকাশিত হয়েছিল। লেখাটি পুনরায় কর্ণফুলী'র আর্কাইভ থেকে খুঁজে এনে, অন্তত এক কিস্তির জন্যে হলেও, প্রচ্ছদে (হোমপেজ) পুনরায় ঝুলানোর জন্যে ইতোমধ্যে কয়েকজন বিদগ্ধ পাঠক আমাদেরকে লিখিতভাবে অনুরোধ করেছেন। লেখাটি নিয়ে কোন মন্তব্য থাকলে আমাদের জানাতে দ্বিধা করবেন না।

ইমেইল # bivuamin@gmail.com

প্রতিবেদকঃ বনি আমিন, সিডনী, ২৫ মার্চ ২০০৬ (www.karnafuli.com)